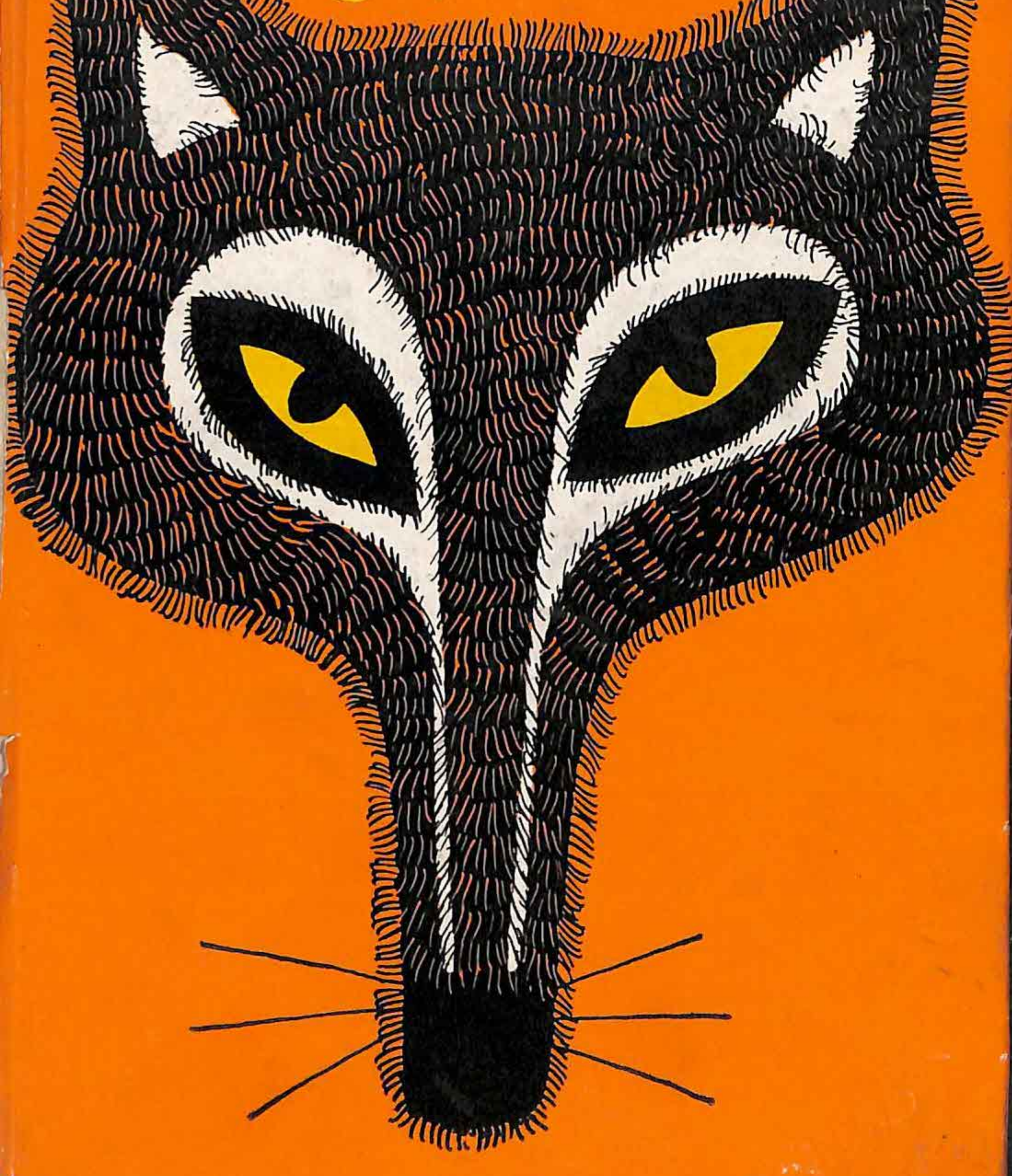
গিরিধারী কুন্ডু

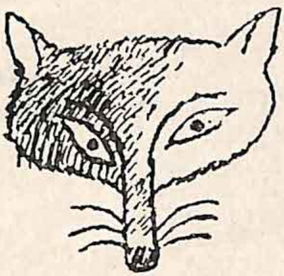
বুশাই



বুলাই

BULAI Rs. 5·00
By
GIRIDHARI KUNDU
Dey's Publishing c/o Dey Book Store
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073

বুলাই



গিরিধারী কুন্ডু

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
২২ নভেম্বর ১৯৭৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

পাঁচ টাকা

এই বইতে আছে

মাষ্টার অপু

আর

জয়দীপ ঘোষকে

এই লেখকের অন্যান্য বই

দুষ্টু টুসটুসি

টংসা চু

রাত একটা

বুলাই

ছুটতে-ছুটতে এসেছে নেংটি ইঁদুর।

—"আজকের খবরের কাগজ দেখেছেন ?"

মেজাজ ভালই ছিল। তবু চমকে উঠলেন সিংহরাজা।

—"কেন, কী খবর বেরিয়েছে ?"

আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা তালপাতা তুলে ধরল নেংটি। বলল, —"এই দেখুন এখানটায় কী লিখেছে !"

খবরের কাগজ বলতে এখানে তালপাতাকেই বোঝায়। খবরের উপর চোখ বোলাতে বোঝা গেল, রাবংলা ফরেস্টের পেটুক শেয়ালবাবু আগামীকাল তিনধারিয়ায় বেড়াতে আসছেন।

সিংহমশায় এখানকার ফরেস্টের বর্তমান রাজা। বয়েস হয়েছে অনেক। ভাল দেখতে পান না চোখে। পেতলের সরু ফ্রেমে গোল



কাচ-বসানো চশমা ব্যবহার করেন। কাঠের খুঁটির উপর থেকে চশমা তুলে নিয়ে খবরটা আরও কয়েকবার পড়লেন।

সাদা ভুরু দুটো কুঁচকে গম্ভীর গলায় বললেন,—"তাই তো! এখন কী করা যায় নেংটি? এই রাবংলা ফরেস্ট কোথায় আছে রে?"

নেংটি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল,—"সিকিমের উত্তরে এই রাবংলা ফরেস্ট। এর সম্পর্কে আপনি হয়তো বিশেষ কিছু জানেন না!"

সিংহরাজা গর্জন করে উঠলেন।

—"নেংটি, এ কথার মানে?"

নেংটি ভয়ে-ভয়ে বলল,—"এ শেয়ালটাকে সবাই বুলাই নামে ডাকে। ও ভীষণ পেটুক আর পাজি। দেখতে মহিষের মতো একেবারে কালো। ওর বাবা ছিল ওখানকার পাঠশালার হেডমাস্টার। মুরগি, হাঁস, পায়রা, বাঘ, কুমির, এদের বাচ্চারা ওর বাবার পাঠশালায় পড়াশুনা শিখত।

"বুলাইয়ের বাবা করত কী, ইচ্ছে হলেই ওইসব বাচ্চাকে একের পর এক মেরে খেয়ে ফেলত। মাঝে মাঝে বাচ্চাদের বাবারা পাঠশালায় খবর নিতে গেলে ওই হেডমাস্টার বলত—'কোর্স কমপ্লিট না হলে ওদের সঙ্গে দেখা করা যাবে না।'

"অবশ্য বেশি জোর করলে একটা থলে নিয়ে আসত তখন। অন্য কারুর বাচ্চাকে দূর থেকে একটুখানি দেখিয়ে পরক্ষণে থলের মধ্যে রেখে বলে দিত—'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনি এবার বাড়ি যান। আপনার বাচ্চা ভালই আছে। এখুনি ওদের নিয়ে আমি ক্লাসে যাব। নমস্কার।'

"ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল একদিন। গ্রামের সব জীবজন্তু মিলে রাগে-দুঃখে শেয়াল পণ্ডিতকে পিটিয়ে মেরে ফেলল। সেই থেকে

পেটুক শেয়াল, মানে এই বুলাই সবার কাছে বলে বেড়াত, সে পাঠশালার মাস্টার হবে না! মাছ-মাংসও খাবে না। ফলমূল খেয়ে দিন কাটাবে শুধু।"

রাজামশায় এতক্ষণ মন দিয়ে সব শুনছিলেন। এবার সত্যি সত্যি তিনি চিন্তায় পড়লেন। সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললেন,—"নেংটি, তুই এত খবর কোত্থেকে পেলি ? খবরের কাগজে এসব তো লেখা নেই!"

ইয়া বড় সরু লেজখানা দুকানে দুবার ঠেকিয়ে জানিয়ে দিল নেংটি,—"আমার অপরাধ নেবেন না রাজামশাই। আজকের কাগজ দেখে হাটে সবাই এরকম কথাই বলছিল।"

সিংহের মাথায় কাঁপুনি। একটু চিন্তা করে নিয়ে বললেন, —"স্টেশনে কাল কাকে পাঠাতে পারি, বল দেখি ?"

নেংটি কুচিকুচি দাঁত বার করে বলল,—"কেন, কালো শেয়ালকে আনতে সাদা হাঁসের দলকে পাঠানোই ঠিক।"

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল রাজহাঁস একটা। নেংটির কথায় সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ জানায়।—"সিংহরাজা, আমাদের বাচ্চারা শেয়ালকে আনতে স্টেশনে যাবে কেন ? আমাদের গ্রামের কোনো শেয়ালকে পাঠাতে পারেন আপনি।"

না হেসে পারলেন না সিংহরাজা।—"রাজহাঁস, তোমার মনে এত ভয় কেন ?"

গলার স্বর করুণ হয় রাজহাঁসের।—"পেটুক শেয়ালের সব কথাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে শুনেছি আমি। শেয়াল যদি আমাদের বাচ্চাদের গলা কামড়ে দেয়, তখন ওদেরকে কে দেখবে ?"

হালুম, হালুম।

চেঁচামেচি শুনে গুহার দরজার কাছটায় তাকালেন রাজামশায়।

হলুদ বাঘ বলতে-বলতে এগিয়ে আসছে,—"কী ব্যাপার ? এখানে এত ভিড় কেন ? শেয়ালকে অভ্যর্থনা জানাতে আমি যাব সিংহরাজা।"

হালুম বাঘের কথা শুনে এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন রাজা।

তিনধারিয়া রেল স্টেশনে হালুম এসে অপেক্ষা করছিল পরের দিনও। গলা ভর্তি জল খেয়ে টয় ট্রেন ছেড়ে দিল। এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটা রাস্তা। মালপত্তর রাখার কামরার জানলা দিয়ে কী যেন একটা কালো জিনিস ছিটকে বেরিয়ে পড়ল। রীতিমতো সন্দেহ জাগে হালুমের মনে। এদিকে ছিটকে পড়া কালো ছায়া এগিয়ে আসছে ওরই দিকে। হালুম এগোতে থাকে। মুখোমুখি হল ওরা দুজনে। চার-পাঁচ হাত লম্বা কালো কুচকুচে জন্তুটা হালুমের গা শুঁকছে। ও কিন্তু বুলাই, পেটুক শেয়াল।

দিনের বেলায় প্রকাশ্য রাস্তায় প্রকাণ্ড বাঘকে দেখে বুলাইও কম ঘাবড়ে যায়নি। ভাবছে, বাবা রে! তিনধারিয়ায় দিনেরবেলায় বাঘ ঘুরে বেড়ায়!

হালুম বাঘ নরম গলায় প্রথম কথা বলে,—"আপনি সিকিম থেকে আসছেন ?"

বাঘের কথা শুনে শেয়ালের মনের ভয় দূর হল। সামান্য মুচকি হেসে উত্তর দেয়,—হ্যাঁ, আমি সিকিমের রাবংলা ফরেস্ট থেকে আসছি। আমাকে আপনি বুলাই নামে ডাকতে পারেন।"

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে হালুম বলে চলে,—"আমাদের রাজা আপনাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন। আপনি স্টেশনে নামলেন না কেন ? তাহলে আর এতটা মিছিমিছি হাঁটতে হত না। আপনি কাল এলেন না কেন ?



প্রশ্ন শুনে রাগ হল প্রচণ্ড। তবু হাসতে হাসতে বুলাইকে বলতে হল,—"হ্যাঁ, কালই তো আসার কথা ছিল? জানেন, কাল সোনাদা স্টেশনে ট্রেন এসে পৌঁছতে বৃষ্টি নামল ঝপঝপিয়ে। সে কী বৃষ্টি! গার্ড সাহেব যাত্রীদের জিনিস ঠিক আছে কিনা দেখতে কামরায় উঠলেন। দারুণ রেগে গেলেন আমাকে দেখে। টিকিট দেখাতে বললেন। এদিকে জানলা ছুঁয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসায় সমস্ত শরীর ভিজে গিয়েছিল। তাই সোনাদায় নেমে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে এক বাড়ির কাছে আসতে, মাংসের ঝোলের গন্ধ এল নাকে। গন্ধটা বিরক্ত করতে থাকায় সে-বাড়িতেই কিছুক্ষণ রয়ে গেলাম। এরপর আর ট্রেণ ছিল না। তাই আসতে পারিনি।"

হালুম বুলাইয়ের কথায় কম অবাক হয় না।

—"সে কী, মাংসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে অন্যের বাড়িতে চলে গেলেন? সবাই যে বলছে, আপনি মাছ-মাংস খান না। কথাটা তাহলে মিথ্যে!"

বুলাই বলল,—"সত্যি বলতে কী, মাছ-মাংস আমি পছন্দ করি না বেশি।"

মাথা সামান্য ডানদিকে ঘোরাতে, শেয়ালের পিঠের লাল দাগটা বাঘের চোখে পড়ে যায়। তা দেখে হালুম জানতে চায়,—"বুলাইবাবু, আপনার পিঠে রক্তের দাগ! কোনো পোকামাকড় কামড়েছে?"

একটু হকচকিয়ে গেল বুলাই। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, —"রেলগাড়ির জানলা দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরুতে গিয়ে একটু লেগে গেছে হয়তো!"

টিকিট না কাটায় গার্ড সাহেব যে, পিটুনি দিয়েছেন, সেকথা বেমালুম চেপে গেল বুলাই।

সিংহরাজার গুহায় শেয়ালকে পৌঁছে দিয়ে নিজের বাড়ি চলে গেল বাঘ।

রাত্তিরে শেয়ালবাবুকে কোথায় থাকতে দেওয়া হবে, তা নিয়ে চিন্তায় পড়লেন সিংহরাজা। বাড়িতে পেটুক শেয়াল বুলাইকে থাকার জায়গা দেবে না বাঘ। অসুবিধে অবশ্য আছে। বাঘের একমাত্র মাসি পুষির সঙ্গে শেয়ালদের বনিবনা হয় না। হাঁসেরাও নিজে বিপদে পড়তে চায় না। শেষ পর্যন্ত গুহায় ঢোকার বাঁ পাশে যে ফাঁকা জায়গা রয়েছে, ওখানে বুলাইয়ের থাকার ব্যবস্থা হল।

যাবার আগে সিংহরাজা জানতে চাইলেন,—"আপনার জন্যে এখন খাবারের কী ব্যবস্থা করব ?"

পেটুক শেয়াল এপাশে-ওপাশে লেজ নেড়ে হুম করে বলে ফেলল,—"রাত্তিরে এমন কিছু আমি খাই না। এই ধরুন, তিন চার লিটার দুধ, খাঁটি হলে অবশ্য ভাল হয়। একটু বীট-গাজরের স্যুপ, আর দু-তিন কেজি আপেল হলেই চলবে।"

বুলাইয়ের কথা শুনে ঘাবড়ে যায় রাজা। তারপর ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থেকে মনে-মনে ভাবতে লাগলেন, সাধে কি লোকে বলে পেটুক শেয়াল। হাতির চেয়েও ব্যাটার বেশি খোরাক। মনের রাগ তবু এখুনি প্রকাশ করেন না। একটু হেসে বললেন,—"কিছু মনে করবেন না! তিনধারিয়ায় গরু-মোষের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। পিঁপড়েদের গোয়াল থেকেও এত দুধ পাওয়া সম্ভব নয়। তবে দু-এক লিটার দুধ নিশ্চয় যোগাড় করা যাবে।"

একটু পরে কাঠের প্রকাণ্ড গামলা শুঁড়ে বেঁধে নিয়ে এল হাতি একটা। বুলাইয়ের সামনে সেটা রেখে না-দাঁড়িয়ে থপথপ পায়ে

চলে গেল সোজা। গামলায় ধোঁয়া ওঠা দুধ রয়েছে। জিভ ঠেকিয়ে দুধের সর একটু-একটু করে চেটে মন্তব্য করল বুলাই,—"বাঃ, তিনধারিয়ায় এক নম্বর দুধ তো পাওয়া যায়। সিংহমশায়, আমি আসায় আপনাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে?"

সিংহরাজার মুখখানা বেশ গম্ভীর হয়ে আছে। একটু কিন্তু-কিন্তু ভাব নিয়ে বলল,—"আমাদের আর কী কষ্ট বলুন। ঠাণ্ডার দেশের মানুষ আপনি, এখানকার গরমে কষ্ট পাবার কথা আপনারই। মানুষের বাচ্চারা আজকাল বেশি দুধ খায়। তাই আপনার বেলায় দুধের পরিমাণ একটু কম হল?"

হাসি-হাসি মুখে বলল বুলাই,—"সিংহমশায়, আপনার বয়স হয়েছে। এবার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। পরে আবার কথা হবে। কিন্তু একটা কথা ছিল।"

সিংহরাজাও হেসে ফেলেন বুলাইয়ের এরকম কথা শুনে।

—"কী কথা, চটপট বলে ফেলুন বুলাইবাবু।

—"এখন সাতটা বাজতে চলল। আমার একটা বাতিক আছে। সেবার আসামের ব্রহ্মপুত্রে স্নান করার সময় হঠাৎ কানে জল ঢুকে পড়ে। সেই থেকে কানের ভেতরটা মাঝে-মাঝে কুটকুট করে ভীষণ। এখন ওই রকম হচ্ছে। আমাদের দেশে এ সময় গাছের সরু লতারা দুলে-দুলে কানের ভেতর কাতুকুতু দেয়। এখন—"

সিংহরাজা বললেন,—"আরে, এই কথা।"

নেংটিকে চোখ ঘুরিয়ে ইশারা করলেন। বুলাই সামনের এবং পেছনের পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। (আসলে শোয়নি। শোবার ভান করছে মাত্র।)

নেংটি কানের ভেতর লেজটা সামান্য ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিতে



লাগল। কিন্তু ভয় হচ্ছিল সত্যি। কারণ সিংহরাজা শেয়ালের কানে কাতুকুতু দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে কেটে পড়েছেন। বুলাই যদি একবার হাঁ করে, তাহলে নেংটির ছোট্ট শরীর একেবারে গলা বেয়ে পেটে চলে যাবে। রাজামশায়ের কথাও এদিকে না মানলে নয়।

শেয়াল মিছিমিছি মুখ নাড়তে-নাড়তে ভাবতে থাকে…নেংটি, তোর ওই এক হাত দীর্ঘ লেজখানা আমার কানে ঢুকিয়ে বসে আছিস ? এত সাহস তোর! আজ নতুন এসেছি। কোনো ঝামেলা করব না। কাল এ-সময়ে একবার তোকে পাই না, এক সেকেণ্ডে গিলে ফেলব।

কী যেন মনে পড়ে যায়। শরীর ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল বুলাই। বলল,—"নেংটি, লক্ষ্মী ছেলের মতো যা তো বাবা, জলদি রাজাকে একবার খবর দে। বলবি, আমি ডাকছি, জরুরি।"

রাজার চোখের পাতা জুড়েছিল ঘুমে। নেংটির ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসলেন। একটু পরে বললেন,—"কী রে, ডাকছিস কেন ?"

চোখে-মুখে পুরো দুষ্টুমি। বলল,—"রাজামশাই, আপনার অতিথি বুলাইবাবু ডাকছে!"

রীতিমতো বিরক্ত বোধ করেন। না গিয়ে তবু উপায় নেই।

সিংহরাজা গর্জন করতে করতে এগিয়ে এলেন। ভুরু কুঁচকে সামান্য হেসে জিজ্ঞেস করলেন,—"কী ব্যাপার, ডেকেছেন কেন ?"

বুলাই বলল,—"আপনি দেখছি এর মধ্যেই ভুলে গেছেন। আমার স্যুপ কোথায় ?"

সিংহরাজা রসিকতা করলেন ওর সঙ্গে,—"এ কী কথা! আপনি না মাংসের স্যুপ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন ? তাহলে কিসের স্যুপ পাঠাব ?"

ভালমানুষি ভাব দেখায় বুলাই। লেজখানা কানে দু-তিনবার



ছুঁইয়ে বলল,—"হ্যাঁ, মাছ-মাংসের স্থপ খাওয়া কবে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। গতকাল সোনাদার বৃষ্টিতে এত ভিজেছি যে, শরীরটা এখনো ম্যাজম্যাজ করছে। মনে হচ্ছে জ্বর আসবে রাতে। তাই একটু স্থপ খাবার কথা মনে পড়ল। আমি শুধু স্থপই খাব। মাংস বা হাড় আপনি বরং খেয়ে নেবেন। আপনারও তো শরীরটা ঝিমিয়ে পড়েছে বেশ।"

রাত আটটা বাজে প্রায়। কোনো দোকান খোলা নেই। এ মুহূর্তে রাজামশায় মাংস বা হাড় কোত্থেকে জোগাড় করবেন? রান্নাই বা হবে কোথায়?

রাজার চোখ হুটোর দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠে নেংটি। সামান্য হাসি-হাসি মুখে ইশারা করল এবং কানে কানে বলে দিল,—"আপনার ঘরে যেসব হাড়গোড় পড়ে আছে, সেগুলো এনে একটু জল আর নুন ঢেলে জ্বাল দিলে স্থপ তৈরী হয়ে যাবে।"

সিংহরাজার মেজাজ ভাল হয় এবার।

নেংটি ওর বন্ধুদের ডেকে আনল। গোটা কয়েক হাড় মুখে বয়ে নিয়ে গেল হালুম বাঘেদের বাড়ি। বাঘের মাসি পুষি অসময়ে নেংটিদের আসতে দেখে অবাক হল। তবু বলল,—"কী রে, তোরা আবার এত রাতে কেন এলি?"

সবার আগে নেংটি বলে দেয়,—"পাজি বুলাইয়ের খেয়াল হয়েছে এক গামলা স্থপ খাবে। আর রান্না করার ভার পড়েছে তোমার ওপর মাসি।"

এত রাতে আর ইচ্ছে হচ্ছিল না রান্নাঘরে যেতে। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু বালতি জল ঢেলে পুষি স্থপ তৈরি করতে বসল।

এদিকে পেটুক শেয়াল বুলাইকে দেখতে গাঁয়ের সব হাঁসের ছানা, মুরগিদের বাচ্চারা গুহার সামনে জমায়েত হয়েছে। ওরা মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত চোখ বোলাচ্ছিল। ঝোলার মধ্যে মুখ গুঁজে কী যেন খুঁজছিল বুলাই। হাঁস, মুরগিদের দেখতে পেয়ে পেট মুচড়ে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে সাট করে ঝোলাটা পেছনে সরিয়ে দিল।

হাঁসের ছানারা মুরগিদের বাচ্চাদের বলছে,—"জানিস, ওই ব্যাগটায় সিকিমের টফি আছে। আমরা যদি কেড়ে খেয়ে ফেলি, তাই লুকিয়ে ফেলল !"

মুরগিরা বলাবলি করল,—"না, না। ওই ব্যাগেতে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মজার-মজার পোশাক রয়েছে।"

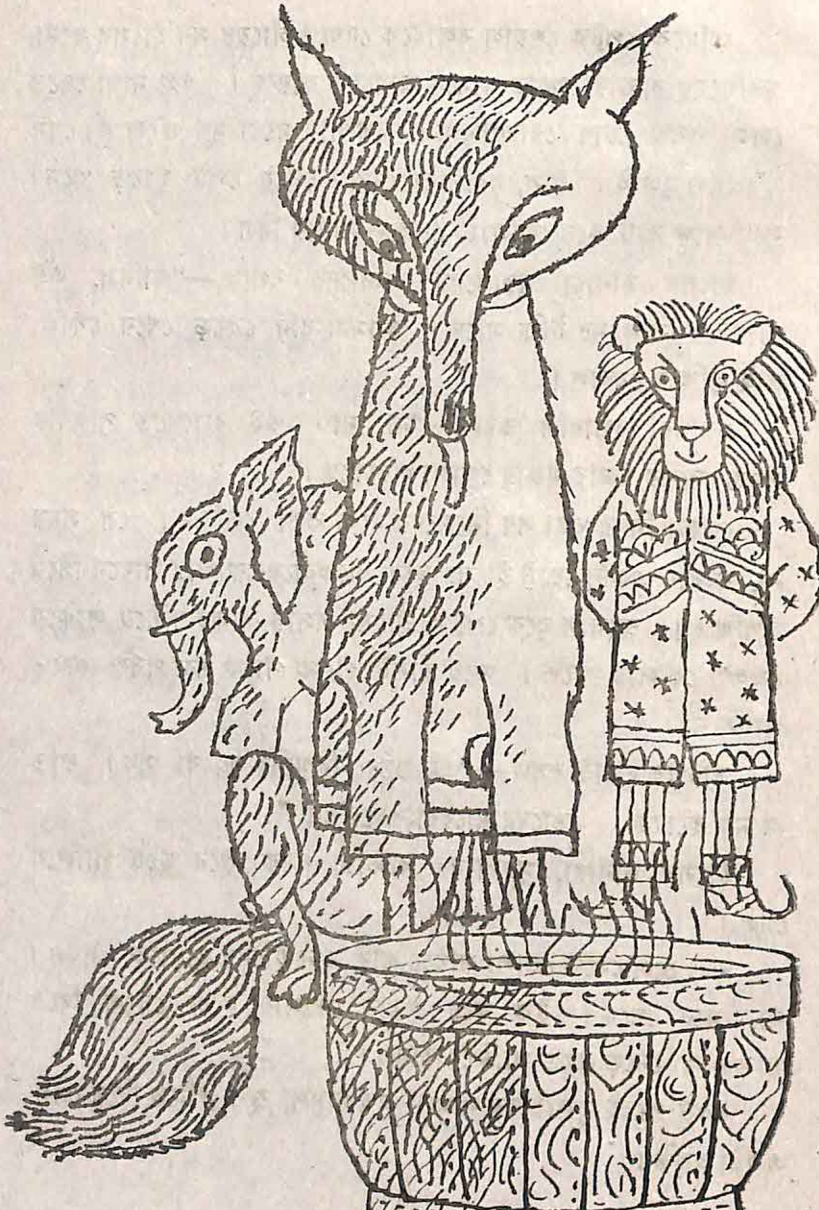
পেছন ফিরে ওরা সব নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। সে সময় না, ধবধবে একটা ছোট্ট হাঁসের ছানা একেবারে ঝোলার সামনে গিয়ে উপস্থিত ! সুযোগ বুঝে শেয়াল হাঁসের গলায় কামড় বসিয়ে লুকিয়ে ফেলল ঝোলার পাশে। ভয়ে হাঁসটা প্যাঁক প্যাঁক শব্দ পর্যন্ত করতে পারল না।

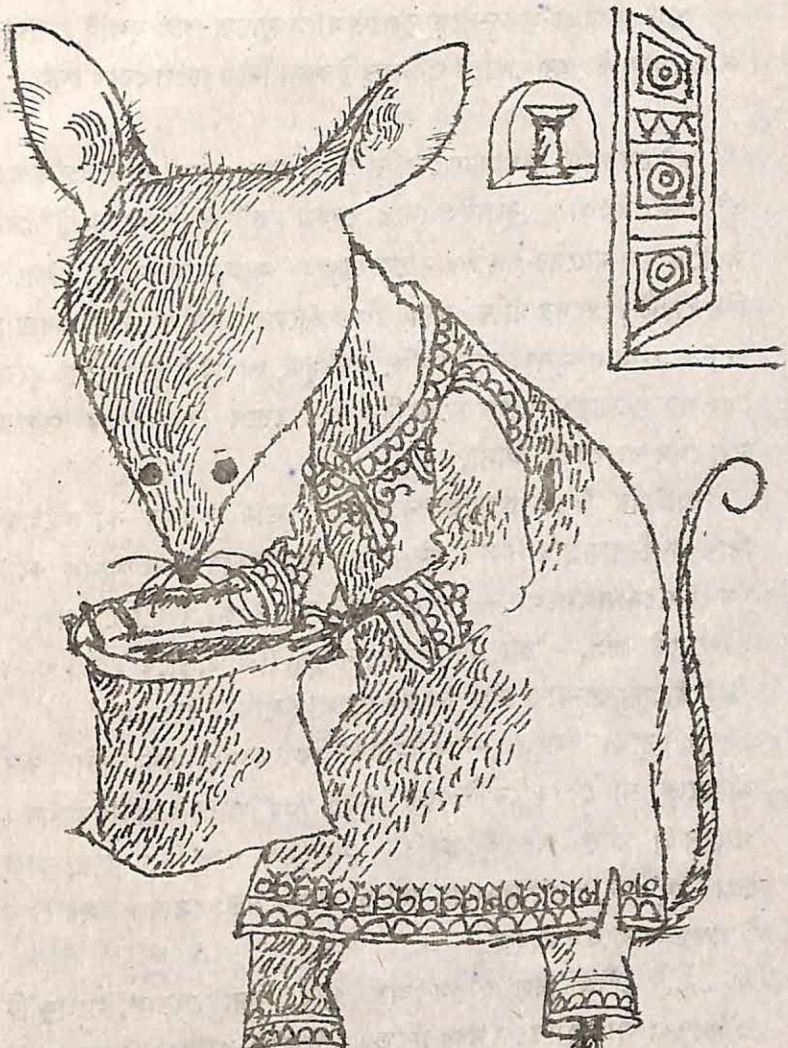
তারপর বুলাই বলল,—"এই দুষ্টুরা, শিগগির ঘর যা সব। রাত অনেক হয়েছে। তোদের মায়েরা বকবে'খন।"

হাঁসের ছানারা, মুরগিদের বাচ্চারা ধমক শুনে ছুটে পালিয়ে গেল।

ওরা চলে যেতে ঝোলা সরিয়ে খুশি মনে হাঁসের ছানাকে দেখল। না, মরে গেছে। টুক করে অমনি ঝোলার মধ্যে ফেলে দিয়ে সব্জিগুলো নেড়ে চেড়ে সাজিয়ে রাখল।

একটু পরেই বুলাইয়ের সামনে এক গামলা সুপ পৌঁছে দিয়ে গেল একটা হাতি।





স্যুপ খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে-তুলতে মাঠে ঘুরতে গেল বুলাই। যাবার সময় ঝোলাটা এক কোণে পাথরের টুকরো দিয়ে চেপে রেখে গেল।

ওই ঝোলাটা দেখামাত্র নেংটির প্রথম থেকে যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছিল। এই তো মওকা। বুলাইও ঘরে নেই। চটপট পাথরের টুকরো সরাতে পচা মাংসের গন্ধ ওর নাকে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝোলা উলটে দিল নেংটি। ওদের গাঁয়ের সবার প্রিয় হাঁসের ছানাকে দেখল এবার। পেটুক শেয়াল বুলাই যে পাজি, এবং ধূর্ত, তা নেংটি ভালভাবে বুঝে ফেলল। ঝোলা আগের মতো ঠিক করে রেখে সিংহরাজার গুহায় চলে গেল ব্যাপারটা জানাতে।

খাটিয়ার উপর শুয়েছিলেন রাজা। ডান কানের কাছে লেজ দিয়ে একটু সুড়সুড়ি দিল। ঘুম ভাঙল সিংহরাজার। তবু অনেক কষ্টে ঘুম-চোখ মেলে বললেন,—"কী রে নেংটি, আবার কী খবর নিয়ে এলি?"

নেংটি বলল,—"রাজামশায়, এখুনি বুলাইকে তাড়াতে হবে। ও না ছোট্ট হাঁসের ছানাকে মেরে নিজের ঝোলায় লুকিয়ে রেখেছে।"

সিংহরাজা বললেন,—"কী সাংঘাতিক কথা। শেয়ালটা কম জ্বালাচ্ছে না তো! নেংটি, তুই একটু ওর ওপর কড়া নজর রাখ। আরেকটা কাজ অবশ্যই করবি। সবাইকে খবর দিয়ে আয়, কাল ভোর ছ'টায় পাগলাঝোরার কাছে জরুরি সভা বসবে। সবাইকে উপস্থিত থাকতেই হবে।"

নেংটি দৌড় দিল হালুম বাঘ, পুষি, সাদা শেয়াল, লালঝুঁটি কাকাতুয়া আর হাতিকে খবর দিতে। হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে এসে দেখে, বুলাই তখনও আসেনি।

বুলাইয়ের থাকার ঘরে এক হাত উঁচু জংলা গাছের নীচে ঘাপটি

মেরে বসে রইল নেংটি। খানিক বাদে লেজ তুলিয়ে ঘরে ঢুকল বুলাই। শোবার চেষ্টা করল ঝোলাটা মাথার নীচে দিয়ে।

ঘুম কী করে আসবে। মশারা ঢ্যাঙা-ঢ্যাঙা পা ছুঁড়ে লাথি মারছে বুলাইকে। ভয় দেখাবার জন্যে বুলাই ওদের বলল,—"ভীষণ দুষ্টু তোরা, বিরক্ত করিস না। একটু ঘুমতে দে। রাবংলা থেকে এখানে আসতে কম কষ্ট হল আমার!"

এক নাগাড়ে ঘণ্টাখানেক মশা তাড়াতে-তাড়াতে পেটুক শেয়ালের পেট খালি হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ ঢুকিয়ে ঝোলা থেকে বার করে আনল হাঁসের ছানাকে। দাঁত দিয়ে পালক ছাড়াতে ব্যস্ত ছিল। ইঁদুরের চাপা গলা কানে এল।—"চিঁ চিঁ চিঁ। আমি দেখতে পেয়েছি। পেটুক শেয়াল তুমি হাঁসের মাংস খাচ্ছ।"

চোখ দুটো তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে! কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল বুলাই,—"আরে, তুই কোথায়? সামনে এসে কথা বল না একবার।"

চোখ মেলে রইল কিছুক্ষণ। চোখে পড়ল না কিছু। ভাবল, ইঁদুর ওর ভয়ে পালিয়েছে। তাড়াতাড়ি হাঁসের ছানাকে মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগল। নিশ্চয়ই ওর কাছ থেকে ভাগ বসাবার জন্যে এসেছিল। ছিঁচকেটা কোথায় গেল এখন?

—"চিঁ চিঁ চিঁ। আমি দেখতে পেয়েছি।"

এবার বেশ ভয় ধরল বুলাইয়ের মনে। কোথায় বসে কথা বলছে। গম্ভীর পায়ে একটু পায়চারি করল। নেংটিকে তবু চোখে পড়ে না কিছুতে। চারপাশ আবার নির্জন হয়। বুলাইয়ের চোখে সত্যি-সত্যি ঘুম নামে এবার।

আকাশ নীল আলোতে ভরে যায়নি তখনও। নেংটি সিংহরাজাকে

তুলে দিয়ে ছুট দিল হালুমদের বাড়ি। হালুম বাঘ আর পুষিকে সঙ্গে নিয়ে গেল বড় হাতির বাড়ি। থপথপে পায়ে চলতে ফিরতে হাতির সময় লাগে বেশি। সে-কথা শুনিয়ে সবাই ঠাট্টা করে হাতিকে। সবে ঘুম ভেঙেছে। বিরক্ত হয়ে সেও বলে দিল,—"তোমরা দৌড়িও না। আমার ভারি শরীর নিয়ে হাঁটতে দেরি হবে-ই। রাজামশায় সে-কথা ভালভাবেই জানেন।"

পাগলাঝোরার কাছেকার সবুজ জঙ্গলে সভা বসেছে। সভায় বনের প্রায় সব জীবজন্তুরা উপস্থিত। হাঁসেরাই প্রথম ওদের রাগ প্রকাশ করল,—"আমাদের ছানাকে গত রাত্তির থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। বুলাই নিশ্চয় ওকে সাবাড় করে ফেলেছে! আপনি এখুনি এ বিষয়ে বিচার না করলে, আমরা হাঁসেরা তিনধারিয়া ছেড়ে চলে যাব।"

সিংহরাজা দুঃখ করলেন,—"আহা! তোরা রেগে যাচ্ছিস কেন? সবাই মিলে ওকে তাড়াবার জন্যে একটা মতলব ঠিক করতে হবে। সে জন্যেই তো এই সভা। সামান্য একটা বিষয়কে উপলক্ষ করে দেশ ছেড়ে চলে যাবি? তোরা এদেশে না থাকলে, আমি কাদের নিয়ে রাজত্ব চালাব?"

বাঘেরাও কম রেগে নেই। একজন বলল,—"আপনি একবার আদেশ করুন রাজামশায়, আমরা ওর মাংসটুকু খেয়ে হাড়গুলো আপনার পায়ের সামনে উপহার দেব'খন।"

হাতি তখন সবেমাত্র সভায় এসে পৌঁচেছে। চেঁচিয়ে বলতে লাগল,—"রাজামশায়, আপনি একবার বলুন শুধু। আমি ওকে পায়ের তলায় ফেলে পিষে মারব।"

সিংহরাজার বয়স হয়েছে। পুরনো দিনের জন্তু। মারামারি, কাটাকাটি পছন্দ হয় না মোটেই। শান্ত গলায় বলতে থাকেন,—"আজ

একটা কথা তোদেরকে বলছি। হিংসা ভাল নয়। হত্যার বদলে হত্যা নয়। তোরা শান্ত হয়ে বসে কথা শোন্। বুলাইকে এখান থেকে কীভাবে তাড়ানো যায়, সে বিষয়ে আলোচনা শুরু হোক এবার।"

মাথা চুলকে নিয়ে নেংটি ফট্ করে বলে ফেলে,—"আমার মতে কলকাতার মস্ত বড় শিকারী টিংলুবাবুর কাছে গিয়ে আমাদের বিপদের কথা বললে ভাল হয়। টিংলুবাবু এখন টুং-এ আছেন। ওঁর কাছে ঘুম-বিস্কুট আছে। বুলাই স্যুপ খেতে ভালবাসে। স্যুপের ঝোলের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে ওই বিস্কুট। তবেই ঘুমিয়ে পড়বে বুলাই। তারপর ওর চার পা বেঁধে হয় পাগলাঝোরার উপর থেকে ফেলে দেওয়া হোক, নয়ত বস্তায় পুরে সিকিমে পার্সেল করে পাঠিয়ে দেব আমরা।"

কথাটা মনে ধরে সবার। এক বাক্যে বেশ বেশ বলে তারিফ করল নেংটিকে। সভা ভেঙে গেল অল্প সময়ের মধ্যে।

বড় হাতিকে সঙ্গে নিয়ে বাঘ, টাট্টু ঘোড়া এবং নেংটি রওনা দিল। প্রায় এগারটা বাজল টুং-এ পৌঁছতে। বাড়ি চিনতে কোন অসুবিধে হল না। বাড়ির সামনে ভিড় দেখে দরোয়ান প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল একটু। তারপর ভয়ে-ভয়ে ডেকে নিয়ে এল টিংলুবাবুকে।

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন টিংলুবাবু,—"কী ব্যাপার, তোমরা কেন ?"

হাতি শুঁড় তুলে নমস্কার জানাল। নেংটি পুরো ব্যাপারটা গড়গড়িয়ে বলে গেল,—"সিকিম থেকে এক শেয়াল এসেছে আমাদের গ্রামে। ভীষণ ধূর্ত শেয়াল। সবাই ওকে বুলাই নামে ডাকে।

বলে বেড়ায়, ও খুবই ভাল জন্তু। এদিকে নিরীহ হাঁসের একটা বাচ্চা খেয়ে ফেলেছে কালকে। জীবজন্তুদের ঘুম পাড়ানোর বিস্কুট তো আপনার কাছে রয়েছে। কয়েকটা আমাদের দিন না। ঘুমিয়ে পড়লেই ওর চার পা বেঁধে পাগলাঝোরা থেকে ফেলে দেব আমরা।"

নেংটির কথায় গোঁফ সোজা রেখে হো-হো-হো শব্দে হাসতে লাগলেন টিংলুবাবু।—"আরে, এত ঝামেলায় যাচ্ছ কেন তোমরা? একটা ভিজিট দিলেই আমি বরং তোমাদের গ্রামে গিয়ে দোনলা বন্দুক চালিয়ে ওকে মেরে আসতে পারি।"

হাতি-বাঘ-ঘোড়া একসঙ্গে বলল,—"না, না, টিংলুবাবু, আপনি সামান্য এ ব্যাপার নিয়ে কষ্ট করবেন কেন? আমাদেরকে আট-দশখানা বিস্কুট দিলেই আমরা চলে যাব।"

—"আচ্ছা, বুলাইয়ের বয়স কত হবে?"

হাতি-বাঘ-ঘোড়া-নেংটি মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। শেয়ালের বয়স জানবার কথা ওদের নয়। আর পেটুক শেয়ালকে গতকালই প্রথম দেখল।

সবাইকে চুপ থাকতে দেখে টিংলুবাবু জিজ্ঞেস করেন আবার, —"আচ্ছা, শেয়ালটার ওজন কত হবে আন্দাজে বলতে পারো?"

সত্যি খুব মুশকিলের কথা। ঘোড়া ঘাড় দুলিয়ে জানাল, —"ওজন বলতে পারছি না, টিংলুবাবু। লম্বায় কিন্তু হাত চারেক হবে।"

মনে-মনে অঙ্ক কষে টিংলুবাবু বলে দিলেন,—"ছ' থেকে আটখানা বিস্কুট দিলেই ঘুম এসে যাবে। তোমরা দশখানা দিও। গতবারের বিস্কুটে কম কাজ হয়েছে। আজকাল তামাম দুনিয়ায় ভেজালের কারবার চলছে। সবে আফ্রিকা থেকে এই স্লিপিং বিস্কুট এসেছে। পরীক্ষা করে দেখতে পারিনি এখনও। তা তোমাদের তাড়া থাকলে

এক ডজন বিস্কুট-ই নিয়ে যাও।"

বিস্কুটের প্যাকেট হাতে পেয়ে হাতির কী নাচ তখন। রাস্তায় জনতার ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসা মুশকিল !

সিংহরাজা শেয়ালের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেলেন। দূর থেকে বাঘ ডাক দেয়, হালুম, হালুম। একটু আসছি বলে বাইরে এলেন সিংহরাজা। বাঘের একেবারে সামনে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, —"কী রে, পেয়েছিস ঘুম-বিস্কুট ?"

বাঘ উত্তর দিল,—"পেয়েছি।"

সিংহরাজা বললেন,—"তোদের কাছে রেখে দে। সন্ধেবেলায় স্যুপে মিশিয়ে দিস। সাবধান, কথাটা যেন পাঁচ-কান না হয়।"

এদিকে দুপুরবেলা চার পাঁচ লিটার দুধ, এক হাঁড়ি পান্তা ভাত, বীট গাজরের তরকারি খেয়ে মাঠে ঘুরতে গেল বুলাই। ঝোলাটা কী মনে করে যেন সঙ্গে নিয়েছে। ফিরল সেই ভর সন্ধেয়। নেংটিকে ওর থাকার ঘরে দেখতে পেয়ে খেঁকিয়ে উঠল একটু,—"নেংটি, তুই এখানে যে। আচ্ছা, তোর এখন কোনো কাজ আছে ?"

খিলখিল করে একগাল হেসে নেংটি জানায়,—"পুষি মাসির বাড়িতে যেতে হবে। ওখানেই তো আপনার জন্যে রাতের স্যুপ তৈরি হচ্ছে।"

নেংটির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বুলাই বলে,—"তোর সঙ্গে আমিও যাব ভাই ? আজকের রাতটা ভীষণ অন্ধকার। ঘুটঘুট করছে চারপাশে। তোর বয়স কম। ভয় করতে পারে।"

একথা শুনে ভয় দেখাবার চেষ্টা করল নেংটিও,—"বুলাইবাবু পুষি মাসির বাড়ি যেতে হলে কমপক্ষে দশ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে।

রাস্তায় প্রকাণ্ড এক বাঁশের জঙ্গল পড়বে। ওই জঙ্গলে না, বিরাট সাইজের মশা আছে।"

মশার নাম কানে যেতে বুলাই তিন লাফ মারল। ফাঁকতালে নেংটিও একলাফে বাইরে এসে দৌড়তে থাকে।

স্যুপ তৈরি শেষ হয়েছে। দশখানা বিস্কুট গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দেওয়া হল। এদিকে রান্নার কত দেরি, সে-খবর নিতে এসেছিল নেংটি। ওকে দেখে পুষি বলে ওঠে,—"স্যুপ কেমন তৈরি করেছি, একটু চেখে দেখবি নেংটি?"

নেংটি চেঁচামেচি করতে লাগল,—"তোমার তো মাসি কম বুদ্ধি নয়। ঘুম-বিস্কুট মেশানো স্যুপ খেয়ে শেষমেষ আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আর এদিকে বুলাই এসে আমাকে খেয়ে ফেলুক।"

আর দাঁড়াল না, রাগ দেখিয়ে বেরিয়ে এল নেংটি।

রাত নটা। বুলাইয়ের খাওয়া শেষ হল। ঢেঁকুর তুলতে তুলতে বুলাই যাচ্ছিল মাঠের দিকে। এমন সময় ওর দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললেন সিংহরাজা,—"বুলাইবাবু, আকাশে কালো মেঘ। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে! এখন আর মাঠে-ঘাটে না গেলেন।"

বুলাই কিন্তু এ কথার আসল অর্থ বুঝল না। বলল শুধু,—"ঠিক বলছেন, সিংহরাজা।"

কথা শেষ হয়নি ওর। এ কী কাণ্ড! বুলাইয়ের শরীরের ভেতর আনচান করে। মাথা ঘুরছে কেন? পেটের ভেতরটা মোচড় খাচ্ছে! কিছু ভাল লাগছে না এ মুহূর্তে। দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে। মাটিতে পেট ঠেকিয়ে বেশ কয়েকবার ছুটে-ছুটে গড়াগড়ি খেল।

ঘাস চিবোতে শুরু করল একমনে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পেট থেকে সব বেরিয়ে গেল ঠিকই।

ফিরে এল থাকার জায়গায়। তখনও সিংহরাজা দাঁড়িয়ে আছেন দেখে রাগের মাথায় বলে ফেলল বুলাই,—"আপনারা মোটেই ভাল নন। স্যুপের ঝোল খাওয়ার পর থেকে আমার মাথা কেমন করছিল। ভাগ্যিস, পেট থেকে বার করতে পেরেছি সব।"

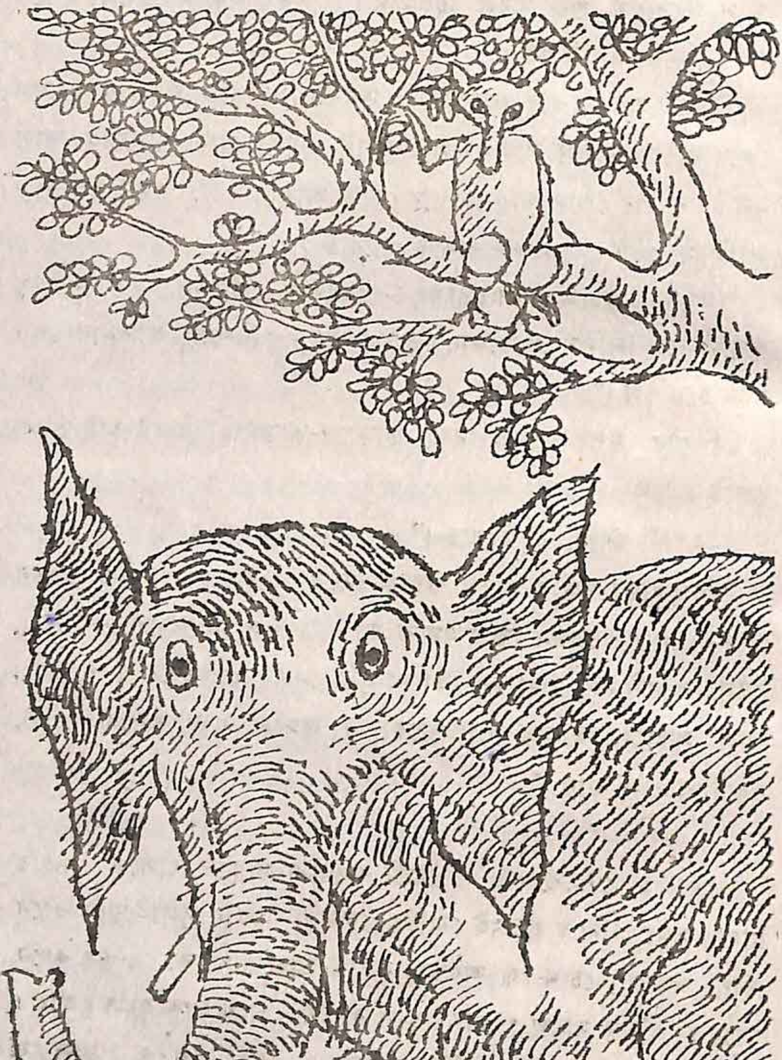
মন্তব্য করলেন সিংহরাজা,—"কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়িয়ে আজেবাজে জিনিস খেয়েছেন, ভেবে দেখুন। নিশ্চয়ই আপনার পেট গরম হয়েছিল।"

পিঠের উপর থেকে মশা তাড়াতে-তাড়াতে বিরাট হাই তুলল বুলাই।

—"কী জানি, কী হয়েছে!"

সিংহরাজা গম্ভীর পায়ে গুহায় ফিরে এলেন। নেংটিও পেছন পেছন এল। পেছন ফিরে ধমকে জানিয়ে দিল সিংহরাজা,—"নেংটি, ঘুরঘুর করিস না! তোদের কোনো বুদ্ধি নেই। ডোজ বেশি পড়েছে। কাল সকালে আবার পাগলাঝোরার জঙ্গলে সভা বসবে। যা, সবাইকে বলে আয়।"

ভোর চারটে বেজেছে। নেংটি রাজাকে ডাকতে এসেছে। গুহায় যাবার সময় এদিকে হঠাৎই নেংটির লেজটা একটু বুলাইয়ের কানে ছোঁয়া লাগে! চোখ-বন্ধ অবস্থায় বুলাই ভাবতে থাকে, কে ওর কানে আচমকা থাপ্পড় মারল? মাথা তুলে ঝাপসা চোখে লক্ষ করল বুলাই। সিংহরাজা নেংটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। বুলাই, পেটুক শেয়াল যে পিছু নিয়েছে তা সিংহরাজা বা নেংটি বুঝল না।



সভা শুরু হতে আজ বেশি সময় লাগল না। মুরগিদের একজন নালিশ করল প্রথমেই,—"কোক্কোরো-কোঁ-কোঁ। এই দেখুন রাজামশায়, বুলাইয়ের ঝোলা কাল আমরা মাঠে পেয়েছি। আমার বাড়িতে দুপুরবেলায় ঢুকে ও দুটো মুরগিছানা চুরি করে মেরে ফেলেছে।"

বুলাইয়ের লাল ঝোলা আর মুরগিছানাদের দেখে সব জীবজন্তুরা ভীষণভাবে রেগে গেছে। হাতি কুলোর মতো কান দুটো দুলিয়ে-দুলিয়ে বলে,—"আপনার কথা আর আমরা শুনব না রাজামশায়। আমি ওকে পায়ের তলায় ফেলে মারব।"

হুক্কা হুয়া—হুক্কা হুয়া—। বুলাই ডেকে উঠল। কান দুটো খাড়া করে বলে দিল,—"চারিদিক চেয়ে আমার মনে হচ্ছে আমাকে মেরে ফেলার জন্যে এই সভা বসেছে। সভা নয়, যেন হুল্লোড় চলছে। তোমাদের মাথায় সব দুষ্টু বুদ্ধি ভর্তি। আমাকে মেরে ফেলা অত সহজ নয়। হ্যাঁ, আমার বাবা হেডমাস্টার ছিলেন, আমি তার ছেলে। চললাম হে!"

গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে সোজা দৌড়তে লাগল বুলাই।

বুলাই তাহলে গাছের ডালে বসেছিল এতক্ষণ। সবাই হতভম্ব। শেয়াল মারার উৎসাহ কোথায় মিলিয়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে রাজামশায়, নেংটি তাজ্জব।

৭ জুন, ১৯৭৭, সোনাদা॥

সত্যি বাঘ

বাসে ভীষণ ভিড়। শরীর ঠাসাঠাসি মানুষ! ওই ভিড়ের মাঝখান থেকে বয়স্ক ভদ্রলোকের হাত ছাড়িয়ে সুড়ুৎ করে পুচকু ছেলে একটা এগিয়ে আসল। সামান্য সরে গিয়ে ইশারায় পাশে বসতে বললাম ওকে।

কিছুতে পাশে বসতে চাইল না ছেলেটা। সামনের রূপো রংয়া ধার ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। বেশ ছটফট ধরনের ছেলে। ওদিক এদিক মুখ চোখ ঘুরছে শুধু। হেলে দুলে বাসও এগোচ্ছে সামনের রাস্তায়।

হঠাৎ আমার মুখের দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে, বলল,

—জানো, আমাদের ওখানে বাঘ আছে।

ছেলেটার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় দুশ্চিন্তা ঢুকল।



সকালবেলাতেই বাঘের নাম! তাও ছোট্ট এক ছেলের মুখ থেকে বাঘের নাম শোনা?

এদিকে আমি তো চুপ হয়ে আছি। ভয়ে চোখের পাতা দুটো পড়বে না, এমন অবস্থা আমার। আসলে ছেলেটার কথা বিশ্বাস করি নি বা শুনতে পাই নি এরকম ভাব নিয়ে রাস্তার দিকে তাকালাম। উঁচু গলায় বলে ফেলল তাই,

—সত্যি বলছি। সত্যি সত্যি আমাদের ওখানে বাঘ আছে, হ্যাঁ—

ওর দিকে চেয়ে এবার হাসি হাসি মুখে বলতে হল আমাকে,

—তাই নাকি?

হাতের পাঁচ আঙ্গুল টান করে নিয়ে মাথার ওপর থেকে মুখের নিচ পর্যন্ত টেনে দেখিয়ে দিয়ে বলল আবার,

—এই এতো বড় মুখ বাঘটার!

হাসি না পেয়ে যায়! ছেলেটা বলে কী? ছোট্ট ছেলের মতো বাঘের মুখ যখন, সে আর কতো বড় বাঘ হতে পারে। এতক্ষণে মনে মনে বাঘের সাইজ আন্দাজ করে নিয়ে বলি,

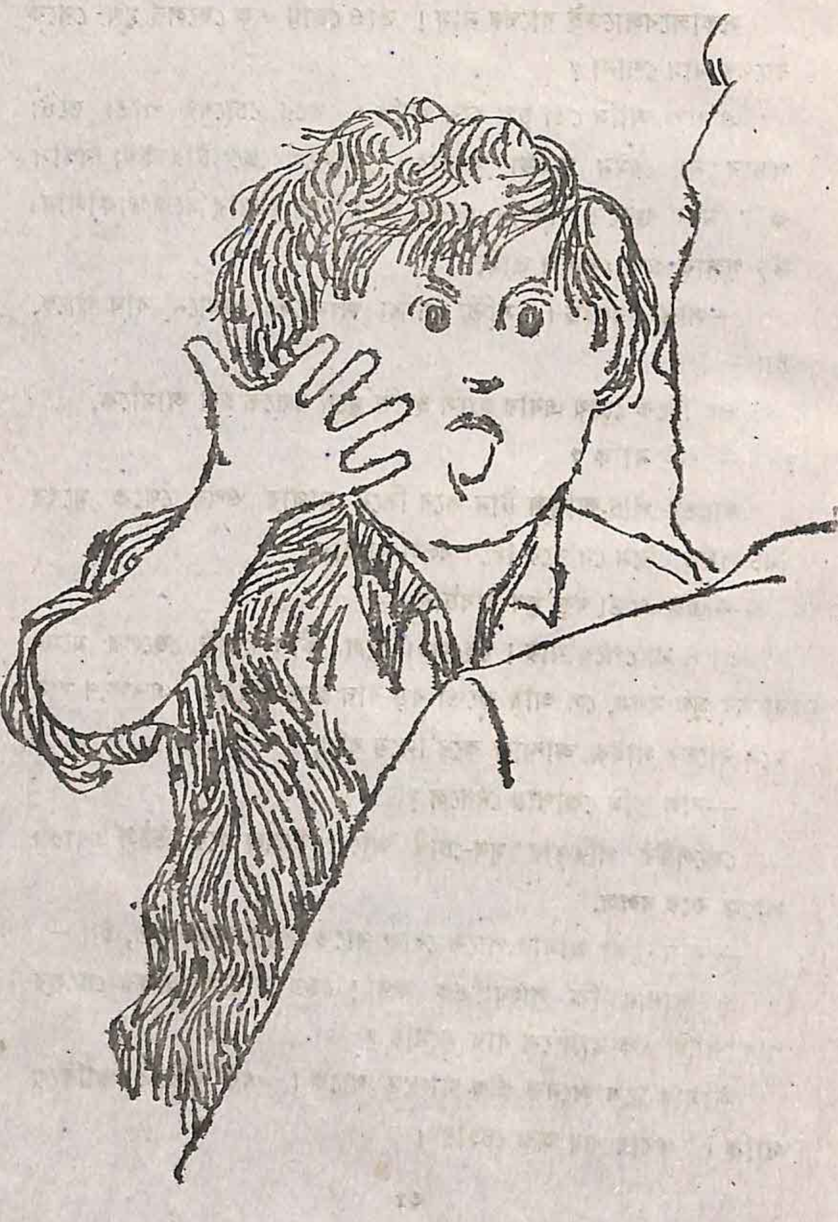
—বাঘ তুমি কোথায় দেখলে?

ছেলেটির পরিস্কার মুখ-চোখ আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠল এবার। আস্তে করে বলল,

—বাঘটা না আমার পাশে রোজ রাতে শোয়, কথা বলে, হ্যাঁ—

এ আবার কি সাংঘাতিক কথা! বছর চার-পাঁচেকের ছেলের পাশাপাশি এক বালিশে বাঘ ঘুমোয়?

আমার মনে অনেক প্রশ্ন জাগতে থাকে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। এবার ওর অন্য চেহারা।



অনেকক্ষণ হাঁ করে থেকে ছেলেটা তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

মাথা সামান্য তুলে ওর মুখের ভেতরটা, জিভ আর ঝকঝকে ছোট্ট দাঁতগুলো দেখতে পাই। তবু কিছুতে বুঝে উঠতে পারছি না, মুখ হাঁ করার অর্থ।

আমার মুখের কথা বন্ধ দেখে ও-ই বলে দিল,

—জানো, বাঘটা না এরকম মুখ খুলে আমার দিকে কখনও কখনও তাকিয়ে থাকে! বলতে কিন্তু পারে না হালুম হালুম, তোমাকে খাবো।

চট করে এবার বুঝে ফেললাম হাঁ মুখের মানে।

ছেলেটার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে উঠলাম,

—তুমি তাহলে বাঘ হতে চাইছ?

মাথা ছুলিয়ে ও বলে যাচ্ছে সমানে,

—যা! আমি কেন বাঘ হতে যাব। আমি তো মানুষ, তোমাকে সত্যি বাঘের কথা বললাম শুধু।

—জানো, ওই বাঘটা না মানুষ খায়।

হাসতে হাসতে বলি,

—তাই নাকি? তুমি তো মানুষ, তাহলে তোমাকে খেল না কেন?

খানিক চিন্তা করল ছেলেটা। তারপর বলল,

—দূর, আমাকে খাবে কেন ওই বাঘটা। ও আমার বন্ধু যে! ও তো আমার সঙ্গে থাকে। ছবিতে।

ছবির বাঘ ছেলেটার সঙ্গে থাকে! এ কথার মানে?

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছেলেটার মুখ দেখছি দেখে বয়স্ক ভদ্রলোক মুখ খুললেন এবার,

—আমার বড় ছেলেকে কিনে দেওয়া গল্পের বই নিয়ে বুমবা সবসময় পাতা ওলটায়। আর ওই বই সঙ্গে করেই ঘুমবে। মিছিমিছি ওকে খাওয়াবে। বাঘকে বারণ করবে দুষ্টুমি না করতে। লক্ষ্মি হয়ে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে বলে।

আর এদিকে ওই বাঘের কথা বলে ও কিন্তু ভয় দেখায় সবাইকে। এখন আপনাকে যেমন ভয় দেখাচ্ছে !

বাস থেকে নামবার সময় হয়ে গেছে। উঠে দরজার দিকে এগোচ্ছি। ছেলেটা বলে উঠল,

—এখানে নাবো, বাঘ দেখতে পাবে।

বাঘ ! বাঘ আবার কখন এখানে এল ?

হাসতে হাসতে রাস্তার অপর ফুটপাথে এসে দাঁড়ালাম। মুখ তুলে জানলার খোপের পাশে দেখতে চাইলাম বুমবাকে। বুমবার উজ্জ্বল চোখ দুটো তখন কোথায় ?

ছুটতে শুরু করেছে বাস। চোখে পড়ল তখনই লাল বাসের পেটের ওপর আঁকা বাঘের মুখ ! ঘ-ড়-ড়-ড় শব্দে মাটি কাঁপিয়ে চার নম্বর ব্রীজের দিকে বাঘ শুদ্ধু বাসটা সত্যি সত্যি অদৃশ্য হয়ে গেল !

১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪, কোলকাতা ॥

রাজকুমার

রাজা এলেন গভীর জঙ্গলে। প্রায় দিন শিকার করতে পাহাড়ী এ জঙ্গলে তিনি আসেন। শিকার করা রাজার একটা নেশা। সেদিন ঘুরে ঘুরে কোথাও কোন শিকার খুঁজে পেলেন না তিনি।

বরকন্দাজ হেঁটে যাচ্ছিল পাশাপাশি। হঠাৎ নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল সে,

—রাজামশায়, একটা সুন্দর পাখি উড়ে যাচ্ছে! ওকে আপনি মারতে পারবেন ?

রাজা হাসলেন মনে মনে। তারপরই কাঁধ থেকে বন্দুক নামিয়ে গুলি ছুঁড়লেন,—গুড়ুম!

পাখিটা অমনি ওই উঁচু আকাশ থেকে ঝপ্ করে পড়ে গেল মাটিতে। এক দৌড়ে পাখিটাকে কুড়িয়ে নিয়ে এল বরকন্দাজ।



এগিয়ে দিল গুলিবিদ্ধ পাখিকে। পাখি ভীষণ অস্থির, ছটফট করছে সমানে। রাজা হাত বাড়িয়ে পাখি ধরলেন। হাত মাখামাখি হল রক্তে।

শরীর গরম রয়েছে তখনও। রাজা আরও টের পেলেন, পাখীর বুক ধুক্‌পুক ধুক্‌পুক করছে!

মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে গরম সূর্যের গোলা। বেলা অনেক বেড়েছে। রাজপ্রাসাদে ফিরলেন রাজা। রাজকন্যা সুখী ছুটে এল কাছে। বরকন্দাজ পাখিটাকে উঁচু করে ধরে রেখে বলতে লাগল,

—দ্যাখো, আজ তোমার জন্যে এই সুন্দর পাখি এনেছি।

রাজকন্যার জ্বলজ্বলে চোখ দুটো কেন যেন জলে ভরে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল শুধু,

—এমন সুন্দর পাখিটাকে কেনো তোমরা মারলে। পাখি শিকার করতে কোনদিন তো তোমাদের বলিনি। রাজামশায়, তোমার সঙ্গে আমার আজ থেকে আড়ি, আড়ি, আড়ি।

দু চোখের ভেতরে ছলছল করছে জল। দাঁড়িয়ে না থেকে রাজপ্রাসাদের ভেতর ছুট দিল সুখী।

দাবাইখানায় বসে ওষুধের শিশি নাড়াচাড়া করছিল হাকিম। সুখীকে অনেক পরে দেখতে পেল সে। বলল মুখ তুলে,

—রাজকন্যার চোখে জল দেখতে পাচ্ছি কেন?

ধরা গলায় সব খুলে বলে দেয় রাজকন্যা।

—একটা পাখি মেরে এনেছে রাজামশায়। হাকিম ভাই, অমন সুন্দর পাখিটাকে কেন মারল বল তো?



ধবধবে সাদা দাড়িতে হাত বোলায়, আর হাসতে হাসতে বলে হাকিম,

—হুঁ, এই কথা। আচ্ছা পাখিটাকে তুমি নিয়ে এসো। দেখি, কী করা যায়।

দৌড়ে গিয়ে ছুটে এল সুখী। ওর হাতে গুলিবিদ্ধ পাখি তখনও ছটফট করছে। যন্ত্রণায় এপাশে ওপাশে পাখনা ঝাপটাচ্ছে। পাখির চোখ দুটো করুণ দেখায়। চোখের দু কোণ থেকে শুধু জল গড়াচ্ছে সমানে।

হাতের মুঠোয় পাখি ধরল হাকিম। উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে তিন তিনবার ফুঁ দিল মাথায়। ছোট্ট শিশি উল্টে আঙুলের মাথা ছুঁইয়ে টলটলে সাদা এক ফোঁটা ওষুধ ঢেলে দিল পাখির গলার ভেতরে। আবার মুখ নেড়ে বিড়বিড় করতে করতে ফুঁ দিল বারকয়েক।

পাখিটা এবার ভীষণভাবে ডানা ঝাপটে চিৎ শরীর খাড়া করল। একটা সরু সুঁচ ঢুকিয়ে গুলিটা বার করে আনল হাকিম। তারপরই প্রকাণ্ড ঘা শেলাই করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

চুপচাপ এতক্ষণ সুখী হাকিমের পাশে বসে অবাক চোখে সব দেখছিল।

দিন যায়, রাত যায়। রাজপ্রাসাদে পাখি রাজকন্যার খেলার সাথী হয়ে আছে। পাখির ওপর ভীষণ মায়া পড়ে গেছে রাজকন্যার। পাখি কিন্তু উল্টো ভাবে। এক ঘরে হয়ে আছে সে ক'দিন ধরে। আকাশে স্বাধীনভাবে উড়তে পারে না। এদেশ থেকে ওদেশে খবর আনা নেওয়াও কবে থেকে বন্ধ হয়ে গেছে! ওর বাড়ীতেও যে সত্যিকারের মানুষজন আছে, এসব কোন কথা অবশ্য বলল না।

রাজকন্যা নেই রাজপ্রাসাদে। সভায় এসে পাখি করুণ গলায় সোজা বলল,

—রাজামশায়, অনেকদিন পার হয়ে গেল। আমি আমার দেশের খবর পাই নি। আপনি আদেশ করুন, আমি আমার দেশে ফিরে যাব আজ।

ভীষণ আশ্চর্য হলেন একথা শুনে। রাজা গম্ভীর হয়ে বললেন,

—যাবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়েছ কেন ?

পাখির গলার স্বর কাতর শোনায়।

—মা, বাবা নিশ্চয় আমার কোন খোঁজ পাচ্ছে না রাজামশায়। আমার জন্যে তারা চিন্তা করছে অনেক।

উত্তর দিলেন রাজা।

—রাজপ্রাসাদে তোমাকে আমি মৃত অবস্থায় এনেছিলাম। রাজকন্যার চেষ্টায় হাকিম তোমাকে বাঁচিয়েছে।

তাছাড়া তুমি চলে গেলে, সুখী ভীষণ একলা হয়ে পড়বে। এতদিন তোমার সঙ্গে খেলা করেছে। এখন সে কার সঙ্গে খেলা করে সময় কাটাবে ?

করুণ গলায় আবার বলে পাখি,

—আমার মা-বাবার কথা একবারটি ভাবুন। তারা হয়ত এই ছ বছর আমার জন্যে ভাবতে ভাবতে বেঁচে নেই আর !

চমকে ওঠেন রাজা।

—কী বললে, ছ বছর ? এই তো সেদিন তুমি এখানে এলে। বড় জোর বছর খানেক হয়েছে।

পাখী চুপ হয়ে গেল।

গভীর চিন্তা এল মনে। কপালে ডান হাত রেখে রাজা একমনে

ভাবলেন অনেকক্ষণ। রাজাকে চিন্তিত দেখে সভাসদরা একবাক্যে বলে উঠল,

—রাজামশায়, পাখিকে ছেড়ে দিন। কিছুদিনের জন্যে একবার দেশে ঘুরে আসুক।

মুক্ত গলায় রাজা বলতে থাকেন,

—যাও পাখী, তুমি মুক্ত।

পাখী বলল,

—রাজামশায়, কখনও আপনার কোন প্রয়োজন হলে তিনবার শুধু আপনি এই বলে ডাকবেন—ঢুঢু পাখি, ঢুঢু পাখি, ঢুঢু পাখি। আমি যে রাজ্যেই থাকি না কেন, তখুনি আপনার কাছে এসে পৌঁছব।

রাজ্যের মেঠো পথ ছাড়িয়ে আকাশের দিকে উড়ে যায় ঢুঢু পাখি। শেষ পর্যন্ত নীল আকাশের বুকে ছোট্ট কালো ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেল।

সুখী, মামার বাড়ি বেড়ি করতে গিয়েছিল। রাণীমার সঙ্গে ফিরে এসে ঢুঢু পাখির দেখা পেল না। রাজপ্রাসাদে বলাবলি করল সবাই,

—মা-বাবার জন্যে মন খারাপ করছিল। তাই নিজের দেশে চলে গেছে পাখি।

তারপর থেকে রাজকন্যা সুখী কারুর সঙ্গে কোন কথা বলল না, কাঁদতে কাঁদতে দিন যায়, রাত ফুরোয়। এভাবে পাঁচটা পুরো দিন কেটে গেল।

পাখির জন্যে ভাবতে ভাবতে আরো মন খারাপ হল রাজকন্যার। ভীষণ জ্বর এল। একেবারে ঝিমিয়ে পড়ল ওর শরীর।

চিন্তিত হলেন রাজামশায়। হাকিমের সব চেষ্টা মিথ্যে হল।

বদ্যিও এল ভিন গাঁ থেকে। তার তুকতাকও কাজ করল না। নিচের ঠোঁট উল্টে রেখে চলে গেল বদ্যি।

আর দেরি না করে নিজে গিয়ে রাজা শহর থেকে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলেন। তবু কিন্তু জ্বর কমতে চায় না কিছুতে। জ্বরের ঘোরে সুখী শুধু ভুল বকছে দিন রাত।

শেষ পর্যন্ত রাজ্যের সর্বত্র ঢ্যাঁড়া দিতে লোক পাঠালেন রাজা।

—'সবাই শোন, সবাই শোন। আট বছরের রাজকন্যা সুখীর জ্বর। সাত দিন পার হয়েছে। তবু তার জ্বর কমবার নাম নেই। রাজকন্যাকে যে সুস্থ করে তুলতে পারবে, তাকে রাজা এক জাহাজ মণি মুক্ত দেবেন।'

পরের দিন বৃদ্ধ এক ওঝা রাজপ্রাসাদে ভোজবাজি নিয়ে এসে উপস্থিত। রাজকন্যার সারা গায়ে ময়ূরের বাহারি পালক ছুঁইয়ে বলে উঠল সে,

—রাজামশায়, সুখী ভাল হবে। কিন্তু—

ওঝার হাত চেপে ধরেন রাজা। অনুনয় করতে থাকেন,

—কিন্তু কিন্তু করবেন না আপনি। বলুন, আপনার কী চাই ?

ওঝা চোখ দুটো বড় বড় করে বলে ওঠে,

—আকাশের মতো নীল রংয়া দুটো পুঁথি এখুনি এনে দিন আমাকে। তাতেই খেল দেখাব।

আবার রাজা ঢ্যাঁড়া দিলেন রাজ্যে। কিন্তু কেউ ওই ধরনের দুটো পুঁথি নিয়ে এগিয়ে আসে না।

মনে পড়ে গেল টুটু পাখির কথা। ছটফট পায়ে বেরিয়ে এলেন তিনি। খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে এক মনে ডাকতে লাগলেন,



—ঢুঢু পাখি, ঢুঢু পাখি, ঢুঢু পাখি।

পরক্ষণেই পূব আকাশের বুকে কালো একটা ছায়া ফুটে উঠল। ছায়াটা আস্তে আস্তে নিচে নেমে আসছে। একেবারে কাছে আসতেই সত্যিকারের পাখী হয়ে গেল!

রাজা চিনতে পারলেন পাখিকে। এই সেই পাখি, যাকে একদিন তিনি গুলি করে আকাশ থেকে মাটিতে ফেলেছিলেন! বলে উঠলেন রাজা,

—ঢুঢু পাখি, আমাদের সামনে এখন ভীষণ বিপদ।

পাখি,

—কিসের বিপদ রাজামশায়?

রাজার চোখে জল।

—তুমি যেখান থেকে পারো, আকাশের মতো নীল রংয়া দুটো পুঁথি এনে দাও। ওঝা বলেছে, তা না হলে রাজকন্যা সুখীকে বাঁচানো সম্ভব নয়।

দাঁড়াবার সময় নেই আর। পাখি আকাশের দিকে উড়ে গেল সেই মুহূর্তে।

আরো একটা দিন শেষ হয়ে আসছে।

ঢুঢু পাখি ফিরছে না কেন?

সবাই বলাবলি করছে,

—এত দেরি হচ্ছে, তাহলে কী ঢুঢু পাখি নীল পুঁথি খুঁজে পায় নি এখনও?

এদিকে সুখীর নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না, এমন অবস্থার কথা বলে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল ওঝা।

এমন সময় রাজা পাখিকে সঙ্গে নিয়ে সুখীর ঘরে ঢুকলেন। ঠোঁটে

চেপে রাখা ছিল আকাশ-রংয়া ছুটো পুঁথি। রাজার হাতের ওপর পুঁথি দিয়ে দিল পাখি। ওঝার চোখ চমকে ওঠে পুঁথি দেখে!

হাতের তালুতে রেখে সমানে ঘোরাতে লাগল পুঁথি ছুটো। হাতের মুঠো বন্ধ রেখে বার কয়েক ফুঁ দিল ওঝা।

আবার হাতের মুঠো খুলল। হাতের তালুর ওপর অস্থিরভাবে ঘুরছে পুঁথি ছুটো।

এ কি, পুঁথি ছুটোর রং বদলাচ্ছে কেন? সাদা-হলুদ, হাল্কা গোলাপী হয়ে মাঝারি সাইজের ছুটো আপেল হল শেষ পর্যন্ত।

শেষ দেখা দেখতে এসে রাজকন্যার ঘরে এ কি যাছ দেখছে সবাই? কারুর মুখে রা-শব্দ নেই! খুব চমকে গেছে সব।

ওঝা আপেল ছুটোকে কাছাকাছি এনে চোখের ইশারা দিতে, চার টুকরো হয়ে গেল!

প্রকাণ্ড এক খলের ভেতর ফেলে নিজে নিজেই আপেল পিষতে থাকে। তারপরই রাজকন্যার শুকনো ঠোঁটের ধার দিয়ে আপেলের রস ঢালতে লাগল একটু একটু।

মাথা দোলায় রাজকন্যা। ছু চোখের পাতায় ময়ূরের বাহারি পালক ছুঁইয়ে সুর করে বলতে লাগল ওঝা—

জাগো রাজকন্যা, জাগো রাজকন্যা—

মায়াপুরের রাজপুত্তুর মায়ায় ফেলতে চান না।

ওমা, বন্ধ চোখের পাতা অমনি খুলে গেল! একটু বাদেই উঠে বসল রাজকন্যা। ওর সারা শরীরে জ্বরের কোন লক্ষণ নেই এখন। সুখী শুধু বলে,

—ঢুঢু পাখি এখনও ওর দেশ থেকে ফিরে আসে নি?

রাজার দিকে তাকিয়ে ওঝা চেঁচিয়ে উঠল,

—ফুঁক্ ফাঁক্ ফুঁক্, রাজামশায় রাজকন্যা সুস্থ হয়ে উঠেছে। আরে, তাই তো, ওই ঢুঢু পাখিটা কোথায় গেল ? ওকে শিগগির ধরে আনুন।

সবাই পাখিকে খুঁজছে হন্যে হয়ে। ঢুঢু পাখির পক্ষে এত ভিড় ঠেলে রাজপ্রাসাদের বাইরে বেরিয়ে আসা মুশকিল। সিংহদ্বারের কাছে দৌড়ে এসে ওঝা নিজেই ধরে ফেলল পাখি।

রাজকন্যার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওঝা পাগলামী করছে আবার।

একটা চকচকে ধারাল ছুরি দিয়ে ঢুঢু পাখির ডানা দুটো আচমকা কেটে ফেলল। গা বেয়ে তাজা রক্ত ঝরছে সমানে! ওঝা পাখিটাকে ঝোলার ভেতর ফেলে দিয়ে মন্ত্র পড়তে লাগল বিড় বিড় গলায়।

রাজকন্যা সুখীর কোন ভয় নেই মনে। অবাক চোখে তাকিয়ে ছিল ওঝার দিকে। ওঝা চীৎকার করছে সমানে।

—রাজামশায় আরেকটা খেল দেখাব আপনাকে। এ কিন্তু কোন পাখি নয়। অনেক বছর আগে, তা প্রায় বছর ছয় হবে, মানুষ থেকে পাখি বানিয়ে দিয়েছিলাম একে আমি।

সেদিন মায়াপুরের রাজকুমার স্কুল যাচ্ছিল একা। পথে দাঁড়িয়ে আমি ভিক্ষে করছিলাম। কুঁজো হয়ে হাঁটতে দেখে ভেংচি কেটেছিল রাজকুমার। আমার মন মেজাজ সে-সময় ভাল ছিল না। তাই ওকে আমি মন্তর পড়ে এই ঢুঢু পাখি বানিয়ে রেখেছি। যাবার সময় দুটো নীল পুঁথি ওর ঠোঁটে গুঁজে দিয়েছিলাম। যাতে পরে ওকে চিনতে পারি।

এদিকে মায়াপুরের রাজা-রাণী ভাবলেন, তাঁদের রাজকুমার স্কুল যাবার পথে নিরুদ্দেশ হয়েছে।

আজ আমি ওর জীবন ফিরিয়ে দেব রাজামশায়।

বলতে বলতে ডুগডুগি বাজিয়ে ঝোলা খুলল ওঝা।

এমা! কী সুন্দর ফুটফুটে বছর দশেকের একটা ছেলে বেরিয়ে এল ঝোলার ভেতর থেকে। সত্যিকারের রাজপুত্রের মতোই দেখতে। রাজকুমারকে হঠাৎ দেখে সুখী লজ্জা পেয়ে গেছে একটু।

মায়াপুরে খবর পাঠালেন রাজা। ওদেশের রাজা-রাণী এলেন ছুটে। ছ বছর পর রাজকুমারকে খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা।

সাত দিন সাত রাত ধরে এ রাজ্যে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল! একসঙ্গে বসে খানা-পিনা করল রাজ্যের সবাই। যাবার সময় ওঝা এক জাহাজ মণি মুক্ত নিয়ে ফিরে গেল নিজের দেশে।

দু দেশের রাজা বলাবলি করছেন—

ঠিক এক যুগ পরে, রাজকন্যা সুখীর সঙ্গে মায়াপুরের এই রাজকুমারের বিয়ে হবে।

১০ আগষ্ট, ১৯৭৯, কোলকাতা ॥

রাজার গোঁফ

দু দেশের দু রাজা।

একজনকে সবাই ডাকে হুল্লোড় রাজা। অন্যজনকে বলে বিল্লির রাজা। দু জনের রাজত্ব একেবারে গায়ে গায়ে লাগানো। শুধু দু দেশের সীমানা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আঁকাবাঁকা এক নদী।

এই নদীর কল কল্ শব্দ শুনতে পায় সবাই। নদীর এ পাড়ে ও পাড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য দোকান। ঘর বাড়িও কিছু আছে। নদীর গা জুড়ে চোখ কাঁপানো কমল ফুটে ফুটে নড়ে। দুধ ধবধবে হাঁসেরা ডুব সাঁতার দিয়ে ঘুর ঘুর করে! ছোটরা পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে হাঁস তাড়ায়। হাঁসের দলের সঙ্গে কানামাছি খেলে।

রাজা দু জন কিন্তু এক স্বভাবের নয়। আচার-আচরণ ভিন্ন প্রকৃতির। হুল্লোড় রাজা হৈ হুল্লোড় পছন্দ করেন বেশি। ঘুমনোর



সময় ছাড়া সব সময় তিনি প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে মেতে আছেন হৈ হৈ মজায়। মোট কথা, সব সময় আমোদ ফুর্তি না হলে তাঁর সময় ফুরতে চায় না।

এদিক দিয়ে বিল্লির রাজার স্বভাব প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা।

রাজসভায় এসে রাজত্বের খবরাখবর নিয়ে দুপুরে ফিরে যান বিশ্রাম-ঘরে। তারপর প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে শুরু করেন ছবি আঁকা। রাতে কোন কোনদিন গানের জলসাও বসে তাঁর ঘরে।

আকাশেতে বরফেরা থাকে
বৃষ্টির সঙ্গে টুপ্ টাপ্ করে পড়ে,
ওদের তো নেই কোন বিছানা
মাঠে ঘাটে পথে শুয়ে থাকে!
আকাশেতে বরফেরা থাকে......

বেশি দিন চুপচাপ থাকতে পারেন না রাজারা! অশান্তির শুরু হল একদিন।

ভুল অবশ্য বিল্লির রাজাই প্রথম করলেন। সেদিন ছবি আঁকতে বসেছেন রাজা বিল্লি। হঠাৎ কী মনে হতে একবার ভাবলেন··· এতদিন প্রকৃতির বিষয় নিয়ে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন। এবার মানুষ অথবা মানুষের বিষয় নিয়ে ছবি আঁকলে কেমন হয়? যেমন ভাবা, তেমনি কাজ।

প্রথমে বিল্লির রাজা আঁকতে শুরু করলেন সেনাপতির মুখখানা। সেনাপতি ছাড়া আর কেউ খুশি হতে পারল না সে-ছবি দেখে।

ছিঁড়ে ফেললেন ছবিখানা!

রাজার রং তুলিতে এবার জীবন্ত হল প্রধান পুরোহিত। কপালে তিলক কাটা, নাক মোটা, ভুঁড়ি চ্যাপ্টা পুরোহিতের ছবিও কারুর চোখে সইল না।

যেই না ডাইনী বুড়ির ছবি আঁকতে বসলেন রাজা, রাজার ছোট্ট বন্ধুরা, ছোটরাও দু চোখ ঢেকে পালিয়ে গেল! ডাইনীর ছবি রাজা পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন।

সত্যি সত্যি রাজার মন খারাপ। ছবি আঁকা বন্ধ রাখলেন কিছুদিনের জন্যে। রং তুলিতে আঙুল পর্যন্ত ছোঁয়ান না।

মুষড়ে পড়তে দেখে রাজাকে একজন এক ফাঁকে বললেন,

—হুল্লোড় রাজাকে নিয়ে কিছু একটা ভাবুন না।

সাধারণ মানুষের ছবি না এঁকে, ওই হৈ হুল্লোড়ে রাজা হুল্লোড় ছবি আঁকলে কেমন হয়?

দারুণ চিন্তা মাথায় এসেছে!

রাজা বিল্লির তুলিতে জীবন্ত হতে লাগলেন রাজা হুল্লোড়।

সে-কথা পাঁচ কান ঘুরে রাজা হুল্লোড় কানে পৌঁছতে খুব দেরি হল না। আর যায় কোথায়? একেবারে হৈ হৈ শুরু করে দিলেন নিজে নিজেই। একজোড়া পায়রা উড়িয়ে দিলেন আকাশে।

পায়রারা ফিরে এসে পাখনা নেড়ে নেড়ে জানায়—হ্যাঁ, ওদের রাজার ছবি-ই দেখে এসেছে বিল্লির রাজার ঘরে।

ঘোড়া সাজিয়ে রাজা হুল্লোড় তৈরি করে নিচ্ছেন নিজেকে। সামনাসামনি গিয়ে ব্যাপারটা জানা দরকার।

অনেক দিন পর রাজাকে রাজার পোশাক পরতে দেখল সবাই। হীরে মুক্তো বসানো সোনার মুকুট মাথায় পরলেন রাজা হুল্লোড়। খাপে ঢোকানো তলোয়ারে হাত দিলেন তারপর।

যা! জং ধরে গেছে তলোয়ারের গায়ে। কতদিন যুদ্ধ করেন নি রাজা। (হুল্লোড় রাজা কী আর নিজে যুদ্ধ করেছেন কোনদিন!) তা হোক, তলোয়ারটা কোমরের পাশে থাকলেই যথেষ্ট! খাপটা তো চকচক করছে! এটা দেখেই পাঁচজনে ভয়ে পাঁচ পা পিছিয়ে যাবে।

ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলেন রাজা। রাজার রাগারাগি ভাব লক্ষ্য করে সিপাই-সান্ত্রীরা তাঁর পেছন নিল ভয়ে ভয়ে। রাজাকে একা ছেড়ে দেওয়াটা ভাল দেখায় না। কখন কী বিপদ ঘটে যায়!

ঘোড়া ছুটছে শয়ে শয়ে।......

এদিকে এক পাল ঘোড়াকে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে এগিয়ে আসতে দেখে বিল্লির রাজার সিপাইরা আঁতকে উঠল সব। হঠাৎ চারদিকে 'সাজ সাজ' রব পড়ে গেল!

বিল্লির রাজার প্রধান সিপাই রাজাকে জানাতে এল। সামান্য চোখ তুলে রাজা জানতে চান।

—এ সময়ে তুমি যে! কী সংবাদ নিয়ে এলে?

কুর্ণিশ করে মন্ত্রী বলে,

—হুজুর, আমাদের দেশের দিকে শয়ে শয়ে ঘোড়া ছুটে আসছে!

রাজার চোখে-মুখে হাসি।

—শয়ে শয়ে ঘোড়া ছুটে আসছে! এ খবর তো দারুণ আনন্দের। ঘোড়াগুলোকে চটপট থামিয়ে তারপর ঘোড়াশালায় রেখে দাও।

বিল্লির রাজার কথা শুনে প্রধান সিপাই কিন্তু কিন্তু চোখে তাকায়। তারপর-ই গলা পরিষ্কার করার জন্যে ঘরের বাইরে এসে খুক্ খুক্ কাসে। খানিক বাদে ফিরেও এল।

হাতের তুলি নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করেন রাজা,

—আবার কী হল ?

—মাথার মুকুট দেখে মনে হচ্ছে, হুল্লোড় রাজা দলবল নিয়ে আমাদের দেশ আক্রমণ করতে আসছেন। মহারাজ, আমাদের কর্তব্য কী ?

মন্ত্রীর কথাগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস হতে চায় না। বিশ বছর ধরে রাজত্ব করছেন। কোনদিন ঝগড়া-মারামারি তো দূরের কথা, তাঁদের মধ্যে কথা কাটাকাটি পর্যন্ত হয়নি।

নিজে একবার দেখবার জন্যে বিল্লির রাজা বাইরে চোখ রাখলেন। সত্যি, সিংহদ্বারের চারপাশে ভয়ংকর এক ভিড় জমে রয়েছে। মাথা তুলে তুলে চিঁ চিঁ গলায় ডাক ছাড়ছে এক একটা ঘোড়া। হৈ হৈ আওয়াজ ভেসে আসছে ওখান থেকেই।

আঁকা বন্ধ করে সিপাইকে বলে দিলেন,

—যাও রাজাকে রাজার সম্মান দিয়ে এখানে নিয়ে এসো।

হুল্লোড় রাজা ঘোড়া থেকে মাটিতে পা রাখলেন। সবাই কুর্নিশ করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এল তাঁকে।

বিল্লির রাজা নরম গলায় জিজ্ঞেস করেন,

—কেমন আছেন আপনি ?

রাজা হুল্লোড়ের মনের রাগ তখনও পড়েনি। গলা ঝাঁকিয়ে বলে দেন,

—আপনি কী আর ভাল থাকতে দিলেন ?

গলার স্বরে বিস্ময় ফুটে ওঠে,

—এ কথার মানে! কী বলতে চান আপনি ?

শরীরের পেছনে দু হাত চেপে ধরে বলতে থাকেন এবার,

—আপনি আমার ছবি কেন আঁকলেন ? আপনাকে আমার ছবি আঁকতে কে অনুমতি দিয়েছে ?

হুল্লোড় রাজার মনের রাগ ধরতে পেরে বিল্লির রাজা হো হো করে হেসে উঠলেন।

—দারুণ ছবি এঁকেছি। চলুন, দেখাচ্ছি আপনাকে।

দু রাজা পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন। সিপাই-সান্ত্রীরা দুপাশে সরে গিয়ে রাজাদের এগুতে সাহায্য করল।

বিশ্রাম-ঘরের ঠিক মাঝখানে শোভা পাচ্ছে বিল্লির রাজার আঁকা রাজা হুল্লোড় ছবি। হুল্লোড় রাজা দুচোখ কপালে তুলে চীৎকার করে ওঠেন,

—এ কি, আমার গোঁফ কী অত মোটা আর বিচ্ছিরি দেখতে ?

রাজা ভেবেছিলেন, এত পরিশ্রম করে আঁকা ছবি দেখে হুল্লোড় তাঁকে শিল্পী হিসেবে বারবার তারিফ করবেন। তা নয়, গোঁফ নিয়ে একি ধরনের কথা বলছেন !

একটু নরম গলায় বলে উঠলেন,

—গোঁফ জোড়া একটু মোটা রেখেছি, কারণ তাতে মহামান্য রাজা হুল্লোড় ব্যক্তিত্ব আরো প্রখর দেখাবে। সবাই বলাবলি করছে, দারুণ ছবি হয়েছে। আর আপনি খুশি হতে পারছেন না ?

আর্তনাদ করে বলে ওঠেন রাজা হুল্লোড়,

—আমার ব্যক্তিত্ব আপনার আঁকা ছবিতে প্রখর ভাবে ফুটে উঠেছে ! বাজে বকবক করবেন না। নাকের নীচেকার পাকানো এক ইঞ্চি গোঁফকে প্রায় তিন ইঞ্চি বানিয়ে রেখে, এখন আবোল-তাবোল



বোঝাবার চেষ্টা করছেন ? ছবিতে কত গম্ভীর দেখাচ্ছে বলুন তো। আর আমাকে কম বয়সী দেখাচ্ছে কেন ?

বিল্লির রাজা হুল্লোড় রাজাকে থামাতে চেষ্টা করেন,

—ঠিক আছে, এই সামান্য ভুলটা আমি ঠিক করে ফেলব। আর ঠিক করেছি, এ ছবিটা আপনার জন্মদিনে উপহার স্বরূপ দেব।

হুল্লোড় রাজা গলা ফাটিয়ে বলে দেন,

—এসব কথায় মহারাজ হুল্লোড় সিং নরম হয় না।

তারপরই চোখ দুটো মুচড়ে বলে ওঠেন,

—এ ছবি আপনি নষ্ট করে ফেলুন ! নয়ত—

বাকী কথা ইচ্ছে করেই মুখের ভেতর চেপে দিলেন ! বিল্লির রাজা ভাবলেন, এত সময় নষ্ট করে, রং ঢেলে ছবিটা এঁকেছেন, তা নষ্ট করতে বলছে হুল্লোড় সিং ! ও সব হবে না !

বিল্লির রাজা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে কিছুক্ষণ তাকালেন হুল্লোড় সিংয়ের দিকে। তারপর বললেন,

—আমি এ ছবি নষ্ট করব না। আপনার যা ইচ্ছে করুন।

রাজা হুল্লোড় গটমট করে হাঁটতে হাঁটতে বিশ্রাম-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সিংহদ্বারের কাছে অপেক্ষা করা সিপাই-সান্ত্রীদের দিকে তাকিয়ে বলে চললেন—

এদেশের মহামান্য রাজা আমার মুখের ছবি বিশেষতঃ গোঁফ বিকৃত করার চেষ্টা করেছেন। নিজের চোখে তা আমি দেখে এলাম। তোমরা কী ব্যাপারটাকে সাধারণ বলে ভাবছ ?

মুখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে চোখ চায় সব। কী উত্তর শুনলে রাজা খুশি হবেন, তা কেউ জানে না, বুঝতে পারে না।

সিপাইদের চুপ থাকতে দেখে রাজা হুল্লোড় উত্তপ্ত গলায় ঘোষণা করেন,

—আমরা এখন সব নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি।

শয়ে শয়ে ঘোড়া ধুলো উড়িয়ে ফিরে এল হুল্লোড় রাজ্যে।

রাজার গা থেকে লোহার বর্ম ঢিলে হল। তলোয়ার খুলে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলেন। সোনার মুকুট মাথা থেকে খুলে সিন্দুকে ভরে রাখলেন।

এ রাজ্যের ও রাজ্যের সব মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। ক্লান্ত সিপাই-সান্ত্রীদের চোখ শুধু ঢুলছে। বিছানায় মাথা রাখার হুকুম নেই। রাজা হুল্লোড় সিং বলে দিয়েছেন,

—যে বিছানা পেতে ঘুমিয়ে পড়বে, তার মাথা কাটা যাবে।

বলা যায় না, রাজা বিল্লির সিপাইরা যদি রাতের অন্ধকারে রাজা হুল্লোড়কে শাসাতে আসে!

বাতাস কাঁপে হু-উ-উ-হো-হো-শি-শি-হি-হি! সাথে সাথে প্রকাণ্ড ঘরের ভেতর ঝাড় লণ্ঠনগুলো কেঁপে ওঠে। টুং টাং শব্দ শোনা যায় দেয়াল-ঘড়ি থেকে।

হুল্লোড় রাজার চোখেও ঘুমের নাম নেই। দুহাত পেছনে রেখে পায়চারি করছেন আর এক মনে ভাবছেন,······বিল্লির রাজাকে কিভাবে জব্দ করা যায়!

বিল্লির রাজার চোখেও ঘুম আসেনি। বিশ্রাম-ঘরে বসে ছবিখানা দেখছেন বারবার। একবার ভাবলেন, ছবিটাকে নষ্ট করে ফেলবেন! পরক্ষণে ড্রয়ার থেকে তুলে নিয়ে দেখতে থাকেন পুরনো ছবিটা! হ্যাঁ, এই ছবিখানার দিকে চোখ রেখে তিনি হুল্লোড় রাজার ছবি এঁকেছেন।

আচ্ছা, এ ছবিখানা নিয়ে একবার ওই হুল্লোড় সিংকে দেখিয়ে এলে কেমন হয় ? দেখি, ও কী বলে !

ভাবতে ভাবতে রাজা বিল্লি ঘুমিয়ে পড়েন।

পরের দিন বিল্লির রাজা এলেন হুল্লোড় সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে একজন ছাড়া আর কেউ আসেনি দেখে, সান্ত্রীদের চোখ চমকে চমকে উঠল ! বলাবলি করল সবাই,

আমরা বিল্লির রাজার রাজ্যে তিন শ ঘোড়া সাজিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম। আর ওই দেশের রাজা মাত্র একজনকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছেন। সামান্য গোঁফ মোটা হবার জন্যে এত হুল্লোড় করার কী আছে ?

বিল্লির রাজা রাজপ্রাসাদে এলেন।

হুল্লোড় সিং কোথায় ?

রাজা হুল্লোড় সিং বসে আছেন সিংহাসনে। মাথাটা হেলে পড়েছে ডান দিকে। শুধু ভেবে চলেছেন……

বিল্লির রাজাকে জব্দ করবেন কেমন করে ?

দূর থেকে বিল্লির রাজাকে দেখতে পেয়ে হুল্লোড় সিং মাথা সোজা রাখলেন।

এদিকে দেয়ালে টাঙানো একটা ছবি দেখে রাজা বিল্লি চমকে ওঠেন। এ ছবির মানুষটি কে ? তাঁর রাজসভায়ও এ ধরনের আরেকখানা ছবি রয়েছে !

হুল্লোড় রাজা হুল্লোড় করতে যাচ্ছিলেন। ফৌজী কায়দায় দাঁড়িয়ে থাকা দুজন প্রহরী ইশারা করল।

বিল্লির রাজা পোষ্ট কার্ড সাইজের ছবিখানা তুলে শান্ত গলায় বলতে থাকেন,

—এই ছবির মানুষ নিশ্চয় মহামান্য রাজা হুল্লোড় সিং ?

হুল্লোড় জানায়,

—আলবৎ এ ছবির মানুষ আমি। এ ছবি আপনি কোথেকে পেলেন ? সাত বছর আগের তোলা ছবি।

বিল্লির রাজা গলা নরম করে বলেন,

—মহামান্য রাজা হুল্লোড় সিং, তাহলে আমার কিছু বলার নেই। এ ছবির গোঁফ দেখেই আপনার ছবি এঁকেছি আমি। আমার কিছু ভুল হয়নি তাহলে !

হুল্লোড় সিংয়ের গলায় আবার আর্তনাদ,

—আপনাকে আর ভুল ভ্রান্তির কথা জানাতে হবে না। আপনি এবার আসুন।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়।

শয়ে শয়ে মানুষের জীবন নষ্ট হচ্ছে ! ভয়ংকর রক্তের স্রোত গড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। জীব-জন্তুদের জীবনও বাদ পড়ে না। লোকের মনে শুধু ভয়, আতঙ্ক।

এদিকে যুদ্ধ চলছে তো চলছে।......

আকাশে কটকটে রোদ্দুর। মাটির শরীর ভেঙে খাঁ খাঁ করছে ! নদীর আঁকাবাকা জলও শুকিয়ে পড়বে বুঝি !

দু রাজার যুদ্ধ দেখে প্রকৃতির মনে রাগ হয়।

চোখ জুড়নো কমল শুকিয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ছে ! দুধ ধবধবে হাঁসেরা সব নদীর জল কমতে দেখে রাগ করে ডাঙায় উঠে এল।

এবং রাজাদের না বলে অন্য নদীর খোঁজে কেন যেন হারিয়েও গেল একদিন।

যুদ্ধ চলতে দেখে নদীর পাড়ে যে সব দোকান ছিল, তারা দোকানের ঝাঁপ ফেলে দিলেন। মানুষেরাও এদিক ওদিক পালাবে পালাবে বলে মন ঠিক করল।

দশ রাত, ন দিন ফুরিয়ে গেল। তবু থামতে চায় না যুদ্ধ। সিপাই-সান্ত্রীদের শরীরের শক্তিও নরম হয়ে পড়ছে! হাত উঠবে না, এমন অবস্থা হাতের।

মনে মনে সব ভাবে, কী করে দু রাজাকে শান্ত করা যায়।

চিন্তায় চিন্তায় সবাই মাথা ঠোকাঠুকি করে।

এক বুড়ি মা এলেন হুল্লোড় সিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে। হুল্লোড় রাজার চোখের ঘুম সবে মাত্র ভেঙেছে।

(রাজাদের আর কী, যুদ্ধ লাগিয়ে দিয়ে নিজেরা দিব্যি ঘরে বসে বসে ভাল-মন্দ খান, বিশ্রাম নেন।)

বুড়িকে দেখতে পেয়ে রাজা বলেন,

—তুমি কেন এখানে?

বুড়ি মা কথা বললে কথার শব্দগুলো তারের মতো কাঁপে।

—এ স-ব তো-রা কী ক-র-ছি-স! যু-দ্ধ থা-মা। ব-ড় ভা-ই কী ক-খ-ন-ও ছো-ট ভা-ই-য়ে-র স-ঙ্গে যু-দ্ধ ক-রে?

হুল্লোড় রাজা বিস্মিত না হয়ে স্বাভাবিক গলায় বলেন,

—বড় ভাই, ছোট ভাই, এসব কী বলতে চাইছ তুমি?

বুড়ি মা আবার বলে,

—বিল্লি তোর নিজের ছোট ভাই হয়। আমি সম্পর্কে তোদের

পিসিমা হই। যুদ্ধ চলছে শুনে ছুটে এলাম। তাড়াতাড়ি আসার জো আছে বাবা!

নদীতে জল নেই। মাঝিরা নৌকো ফেলে পালিয়েছে। হাজার ক্রোশ পথ হেঁটে এলাম।

হুল্লোড় গলায় আর্তনাদ ফুটে ওঠে,

—আজে বাজে কথা বলে যুদ্ধ থামাতে চাও? বিল্লি আমার ভাই, এর প্রমাণ তুমি দিতে পারবে?

বুড়ি মা হুল্লোড় রাজার হাত ধরে টান মারে।

দেয়ালে টাঙানো ছবিটির মানুষকে দেখিয়ে বলে,

—ইনি হুত হুতুম রাজ্যির বড় রাজা ভূতেন্দ্র নারায়ণ সিং। তার বড় ছেলে তুই, আর ছোটজন হচ্ছে বিল্লি।

ছোট থেকেই তোদের দুজনের মধ্যে বনিবনা হয়নি। তাই তোর বাবা এক রাজ্যিকে দুভাগ করে তোদের দুজনকে দিয়ে গেছেন। সে সব কী আর তোদের মনে থাকার কথা?

মহারাজ হুল্লোড় সিং নাকের নীচেকার পাকানো গোঁফ খাড়া করে রেখে আদেশ দিলেন,

—যুদ্ধ বন্ধ!

সিপাই-সান্ত্রীরা যুদ্ধ থামিয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বিল্লির রাজার কাছে হুল্লোড় সিং ছুটে এলেন।

সব শুনে বিল্লির রাজা বললেন,

—দাদা, নদীটা শুকিয়ে গিয়ে ভালই হয়েছে। এখন থেকে তুমি দু দেশের রাজা হবে। আর আমি শুধু দিন রাত ছবি আঁকব।

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯, কোলকাতা॥